Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচিন্তা পুনর্মূল্যায়ন

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Shahrier Rahman
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.4
Pages	৫৩-৬৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচিন্তা পুনর্মূল্যায়ন

Check for updates

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান*

বাংলা লেখ্য ও কথ্য ভাষারীতির ক্রমবিবর্তনে প্রমথ চৌধুরীর নিবিড় ভূমিকাকে শতকান্তরে এসে খানিকটা ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ রয়েছে — এই অনুকল্প বর্তমান রচনার প্রেরণা। প্রায় শত বছর পূর্বে সাধুরীতির একাধিপত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে চলতি রীতির পক্ষ অবলম্বন করে-যে প্রমথ প্রথা ভেঙেছিলেন, সে-কথা নিশ্চয় করে বলা কষ্টসাধ্য নয়। না-হলে 'সাধু'-র বিপরীত শব্দ হিসেবে 'চলতি' শব্দটি কেন তাঁর পছন্দ হবে! 'চলতি' মানেই-তো কোনো কিছুর চলমান অবস্থার ধারণা; চলতে চলতে সে পাল্টাবে এমনই তার স্বভাব। তাহলে এমনটি মেনে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয় যে, ক্রমপরিবর্তমান একটি ভাষারীতির আদর্শ নির্মাণই প্রমথের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁর ভাষারীতি-ভাবনা নিয়ে এরূপ সরল মীমাংসায় উপনীত হওয়া সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না। কেননা, চলতি রীতি বলতে যে ধরনের ভাষারীতির আদল তিনি গড়তে চেয়েছিলেন তা সহসাই পাল্টে যাক এমন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না। *সবুজ পত্র*-কে আশ্রয় করে গড়ে তোলা সেকালের নবীন ভাষাকাঠামো সৌধ-প্রতিম দৃঢ়তা নিয়ে বাংলা ভাষার চলার পথকে শাসন করে চলেছে দীর্ঘকাল– এমন বাস্তবতা সম্ভবত খোদ প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যাশার সঙ্গে পূর্ণসদৃশ। অথচ, চলতি ভাষারীতির অভিধা-নির্দেশিত স্বভাবের সঙ্গে এরূপ প্রত্যাশার সংঘাত অনিবার্য আর এর সূত্র ধরে তাঁর ভাষারীতি-চিন্তার সংকটও ক্রমশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে যাচাই করে দেখার চেষ্টা হবে, ভাষা-পরিকল্পনার এই গুরুদায়িত্ব পালনে প্রমথের সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতার সংযোগতলটি কীরূপ। একইসঙ্গে, নিজের প্রবর্তিত ভাষারীতি-কাঠামোকে তথা সেই ভাষারীতির প্রত্যাশিত প্রবণতাকে অটুট রাখার বিষয়ে তিনি নিজে কতটা সচেতন ছিলেন। এই লক্ষ্যে, উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হবে তাঁর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন গল্পের পাঠ। অর্থাৎ, ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিশীল গদ্যে আলোকপাতের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রবর্তিত চলতি রীতির আদর্শকে বিবেচনা করে দেখা হবে।

মানভাষার ধারণা

দুশো বছরের কিছু বেশি বয়সী বাংলা গদ্য এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ধরনের মানকরণের (standardization) মুখোমুখি হয়েছে চলতি রীতি প্রবর্তনের সময়েই। ভাষার মানকরণ ভাষা-পরিকল্পনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিবেচনা এবং বিভিন্ন মানব-ভাষায় বিভিন্ন কালে এ ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে ও সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এ ধরনের কাজ সবসময় যে ভাষাবিজ্ঞানের কাঠামোবদ্ধ নিয়ম মেনেই ঘটেছে তা নয়, তবে বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় এ ধরনের উদ্যোগের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বিস্ময়কর

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দূরদর্শিতা অনেক কৌশলগত ও প্রণালীগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে সংশ্লিষ্ট প্রচেষ্টাকে কালোত্তীর্ণ সাফল্য প্রদান করেছে। বাংলা ভাষার মানকরণের উল্লিখিত প্রচেষ্টার কালে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়নি; যদিও যেসময়ে এই মানকরণ চলছে সে সময়ে ভাষা-পরিকল্পনার তাত্ত্বিক ধারণার সূত্রপাত না ঘটলেও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পথচলা বেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তারপরও বলা যেতেই পারে যে, এটি বাংলা ভাষার মানকরণের ক্ষেত্রে কোনো বড় সীমাবদ্ধতা ছিল না; অন্তত প্রমথ চৌধুরীর কালে তো নয়ই। মুশকিলটা তৈরি হয়েছে আরও পরে; যখন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিকতম ভাষাবৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাংলা ভাষার পরিকল্পনা করাটা বিশেষ জরুরি ছিল (এবং এখনও আছে) তখনও ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত বাংলা ভাষার অভিভাবকেরা সেটার প্রয়োজন অনুভব করেননি। ফলে, প্রমথ চৌধুরীর মানকরণ প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা হয়নি। সময় পাল্টেছে অথচ একরকম জোর করেই বাংলা মানভাষাকে লেখনে কথনে পূর্বানুরূপভাবে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস বজায় থেকেছে। এই মন্তব্যের রক্ষাকবচ হিসেবে ভাষার মানকরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাষার মানকরণ সম্পর্কে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, এটি একটি সামাজিক চুক্তি যেখানে ওই সমাজের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট ভাষার একটি সামান্য রূপকে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে নিয়মিতভাবে ব্যবহারের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এই সামান্য রূপটির নির্বাচন ও নির্ধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেও হতে পারে আবার ভাষীগোষ্ঠীর গৃহীত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রচলিত রূপ থেকে একটিকে নির্ধারণের মধ্য দিয়েও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ভাষার মানকরণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার সঙ্গে ভাষার মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ভাষার ওপর এর প্রভাব প্রভৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত (Paffey, 2010)। এ কারণে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় যে, সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠী ভাষার একটি মানরূপ নির্ধারণ করে দেয় এবং সমাজের অন্যরা তা মেনে নেয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে খুব একটা ব্যতিক্রমী কিছু ঘটেনি। তবে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মানকরণের বিষয়টি যে দিক থেকে স্বতন্ত্র তা ঠিক-ঠাক বুঝতে হলে সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিখ্যাত সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানী আইনার হাওগেন ভাষার মানকরণ সংক্রান্ত যে তত্ত্ব (১৯৬৬) প্রদান করেন তার প্রতি দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে, সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষার মানকরণের ধারণাটি পাল্টাবে এটাই স্বাভাবিক; কেননা, মানকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কথা মেনে নিলে বাংলা মানভাষার 'চলতি রীতি' নামকরণ সর্বাঙ্গীণভাবে সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু একইসঙ্গে এই প্রশ্নও উঠে আসে যে, বাংলা ভাষার চলতি রীতি কি আদৌ সময়ের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মানকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে! বাস্তবে এরূপ ঘটেনি। অথচ, মানভাষা আর অমান-ভাষার মূল পার্থক্যই হলো প্রথমটির ক্ষেত্রে অনেক রকম আয়োজনের প্রয়োজন পড়ে, আর দ্বিতীয়টি টিকে থাকে ভাষীদের অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ত সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়ায়। এতে করে দ্বিতীয়টি প্রায়শই যে প্রথমটির প্রায়-কৃত্রিম কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাবে তা বুঝে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যই মানভাষার জন্য প্রয়োজন হয় বৃহত্তর ভাষীগোষ্ঠীর সমর্থন, ঐকমত্য, তাঁদের আন্তরিকতা, আনুষ্ঠানিক

তদারকি এবং সময়ের সাথে ভাষার পাল্টে যাওয়ার প্রবণতাকে অনুধাবন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য (Milroy & Milroy. 1999)। ভাষার সফল মানকরণের জন্য উল্লিখিত সকল শর্ত পূরণ অপরিহার্য। মানভাষার সংরক্ষণে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় শিশুরা। সংশ্লিষ্ট ভাষীগোষ্ঠীর শিশুরা কেবল প্রথম ভাষা আয়ত্ত করেই থেমে থাকে না বরং সেই ভাষার নিবিড় শিখনে মনোনিবেশ করে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অভিন্ন একাগ্রতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা ব্যয় করে বানান নিয়ে, ভাষার বিভিন্ন স্তরের সংগঠন নিয়ে, প্রয়োগ-অপ্রয়োগের বিধি নিয়ে; আর তাই এ ধরনের ভাষীগোষ্ঠীর কাছে ভাষার অপপ্রয়োগ অত্যন্ত গর্হিত ও লজ্জাজনক বিষয় বলে বিবেচিত হয় (Trudgil, 2000) — যেমনটা ইংরেজি ফরাসিসহ বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে এখনও ঘটে চলেছে। আবার সময়ের সঙ্গে ভাষা পরিবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিতও করে নেয় মানভাষা। ভাষার মানরূপের এসকল বিশেষত্ব মান-গদ্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। লিখিত অবস্থায় থাকে বলে এর তদারকি অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানরূপ নির্ধারণে ভাষীগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের আন্তরিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। ফিরে দেখা অযৌক্তিক হবে না যে, বাংলা ভাষার মানকরণ প্রক্রিয়া ও এর বিবর্তন কীরূপ ছিল।

প্রমথ চৌধুরীর মানভাষা বিষয়ক আদর্শ

সবুজ পত্র-কে মুখপত্র করে প্রমথ চৌধুরী তাঁর চলতি রীতির কাঠামোকে বিবিধ যুক্তিতে কলকাতার বিদগ্ধজনের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে উপস্থাপন করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিভিন্ন জনের শক্তিশালী সমর্থন যেমন তিনি পেয়েছেন তেমনি নানা বিদ্রূপ ও সমালোচনার সম্মুখীনও তাঁকে হতে হয়েছে। সামাজিক বাধার চেয়ে উৎসাহের পরিমাণ বেশি ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাবই টিকে গেছে; এমনকি পেয়েছে কালান্তরের স্বীকৃতিও। কিন্তু প্রশ্ন হলো : কাদের কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এবং কেন? মনে রাখা প্রয়োজন যে, উনিশ শতকে কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা বিশ শতকে এসেও মূলত তাদের চেতনাগত বিকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নবীন চিন্তা যদি অভিনব শ্রমনির্ভর অর্থনীতি ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমাজনীতির হাত ধরে বিকশিত হতে না পারে তবে তা সাধারণত সমাজের শেকড় স্পর্শ করে না। বাংলা অঞ্চলে নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এই সীমাবদ্ধতা রয়ে গিয়েছিল; অন্তত বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রমথ চৌধুরীর চলতি বাংলা বিষয়ক প্রস্তাবের কাল-পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, উপনিবেশকালের অর্থনীতি ও সমাজনীতি এই নবজাগরণের অনুকূল কোনো শেকড়স্পর্শী পরিবেশ সৃষ্টিতেও সহায়ক ছিল না। তাছাড়া উপনিবেশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সুসমন্বিত ছিল না বলে শেষ পর্যন্ত সমাজের সব স্তরে নবজাগরণকে পৌঁছে দেওয়ার কোনো সম্মিলিত সামাজিক তাগিদ থেকে এই আন্দোলনগুলো অধিকাংশ সময় দূরেই থেকে গেছে। ফলে, নবজাগরণের শুরু থেকেই প্রজন্ম পরম্পরায় রামমোহন-বিদ্যাসাগরদের মতো সমাজসংস্কারকগণ মূলত আস্থা রাখলেন ব্যক্তিগত আদর্শ-অনুপ্রাণিত আধা-উদারনৈতিক মানবিকতাবোধের প্রতি; আর প্রমথ চৌধুরীর মতো স্বতঃপ্রণোদিত 'ভাষা-পরিকল্পনাকারী'র (ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ

(১৯৮৫)-এর বিশ্লেষণ প্রমথকে এ ধরনের উপাধিতে ভূষিত করতে উৎসাহ যোগায়) অবলম্বন হলো কলাকৈবল্যবাদী ভাষিক শুদ্ধতা-প্রত্যাশী দৃষ্টিভঙ্গি। প্রমথ আমৃত্যু যে অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাকে সগৌরবে ধারণ করেই তাঁর চিন্তনবিশ্ব বিকশিত হয়েছে। ফলে, ভাষা নিয়ে যখন ভেবেছেন তখনও এই আভিজাত্য-চেতনাই তাঁর কাছে মুখ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ভাষাবৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকে মেরুদূর ব্যবধানে অবস্থিত।

ভাষাবিজ্ঞানের মূলনীতি হলো একটি ভাষাকে বর্ণনা করা; এর ব্যাকরণিক প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য এবং সংগঠনকে বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন করা। কোনো প্রকার আনুশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে ভাষার জন্য বিধি তৈরি করা ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য, এ ধরনের বর্ণনামূলক তথা ভাষার ব্যবহার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে সক্রিয় ছিল না। তাঁর চিন্তা ও দর্শনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল কলাকৈবল্যবাদী নান্দনিকতা, যা থেকে তাঁর ভাষাচিন্তাও মুক্ত ছিল না। এ কারণে সমাজসংস্কারকদের মতো ভাষা-চিন্তকদের সমাজ-উপলব্ধির সঙ্গেও বাংলা অঞ্চলের বিশাল মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উত্তরণ-প্রচেষ্টা সম্পৃক্ত হলো না। বিশেষ করে বাংলা ভাষার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একান্তভাবেই গুরুত্ব পেল পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্তের পছন্দ-অপছন্দ, যাকে আবার নিজের পছন্দের ছাঁচে ঢেলে গড়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রমথ; আর বিবেচনা-বহির্ভূত রয়ে গেল গ্রাম-জীবন নির্ভর এক বিশাল জনগোষ্ঠী। সমাজে ধনী-গরিবের বিভেদ তো ছিলই, সেইসঙ্গে ভাষারীতি নিয়ে প্রকট হলো আরেক ধরনের বিভেদ; কিংবা বলা যায় সাধু রীতিকে ঘিরে যে মর্যাদাগত বিভেদ আগে থেকেই ছিল তা ক্রমান্বয়ে চলতি রীতির ঘাড়ে চেপে বসল। কলকাতা এবং পরবর্তীকালে উপনিবেশিত আবহে বিকশিত অন্যান্য শহরে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকা শিক্ষিতদের কাছে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম মাপকাঠি হলো ভাষা। ভূমিনির্ভর গ্রামীণ মানুষেরা আরও অনেক কিছুর সঙ্গে ভাষার নিরিখেও তাঁদের কাছে অবজ্ঞাত রয়ে গেল।, 'গাঁইয়া', 'খ্যাত' প্রভৃতি শব্দের বাগর্থগত তাৎপর্য বিবেচনা করলেই দেখা যাবে যে, কীভাবে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষেরা আজও অপমানিত অবহেলিত হচ্ছে।

তাহলে পুরনো কথায় ফিরে গিয়ে আবার বলতে হয়, বাংলা মানভাষা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রমথের কাছে আত্মমুগ্ধ নাগরিক রুচি যতখানি প্রাধান্য পেল, বৃহত্তর ভাষীগোষ্ঠীর চাওয়া তার তুলনায় মোটেই গুরুত্ব পেল না; এমনকি অর্থনীতির কোনো সম্পৃক্তিও ঘটল না। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকশ বছর আগে লাতিনের আধিপত্য কাটিয়ে ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষার প্রতিষ্ঠা ও মানকরণের ইতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে। বিবেচনা করা যেতে পারে, কীভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শ্রমজীবন, জীবিকা, বাণিজ্য প্রভৃতি লন্ডনের উপভাষাকে গোটা ইংল্যান্ডের কাছে গুরুত্ববহ করে তুলেছিল। রেনেসাঁস, ব্যাপক শিল্পায়ন এবং পুঁজিনির্ভর অর্থনীতি সৃষ্টির প্রণোদনায় বহুমানুষের অভিবাসন — আর সেই সূত্রে বিপুল জনসম্পৃক্তি ছিল বলেই সমাজের এলিট এবং শ্রমজীবী ককনি ভাষীদের পরস্পরের কাছাকাছি এনে লন্ডনের উপভাষা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকার মর্যাদা লাভ করে। শুধু তাই নয়, ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড এবং লন্ডনের ভূগোল মিলে ইংরেজি ভাষা-ভাবনা সংশ্লিষ্ট যে 'ইস্ট মিডল্যান্ড ত্রিভুজ' গড়ে

উঠেছিল তা-ই মান-ইংরেজির ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে (Crystal, 1995 : 50)। বস্তুত, একদিকে ভাষীদের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা, বিভিন্ন পাবলিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও ভাষা বিষয়ে অবিরাম উদ্যোগ গ্রহণ এবং অপরদিকে ছাপাখানা আবিষ্কারের সুবিধাকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিশারদদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ইংরেজি ভাষার মানকরণকে টেকসই রূপ প্রদান করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এর অনেক কিছুই বাংলা ভাষার মানকরণের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রমথ চৌধুরীর প্রস্তাব কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যেগের ফল ছিল না। ফলে, একটি ভাষার যথাযথ পরিকল্পনা করতে গেলে যে প্রধানতম দুটি দিক বিবেচনায় নিতেই হয় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনা (status planning) ও অবয়ব পরিকল্পনা (corpus planning)-এর কোনোটিরই পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ তাঁর গৃহীত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ লাভ করেনি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, একদিকে আধুনিক ভাষা-পরিকল্পনার উল্লিখিত ধারণাসমূহের সূত্রপাত সেই কালে ঘটেনি আর প্রমথের পক্ষেও নিজের মতো করে সময়ের থেকে অগ্রসর কোনো সুদূরপ্রসারী ও সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি কিংবা তাঁর চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একদল যোগ্য-উত্তরসূরিও তিনি রেখে যেতে পারেননি। অপরদিকে উপনিবেশ-শক্তির আগ্রহ না থাকায় ইংরেজি ভাষার মানকরণের আদলেও বাংলা ভাষার মানকরণ বিষয়ক কোনো উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেনি। আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, প্রমথ বাংলা ভাষার মানকরণের উপায় হিসেবে চলতি রীতি প্রবর্তনের যে উদ্যোগ নিলেন তা আধুনিক ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ক তত্ত্ব অনুসারে অবয়ব পরিকল্পনার অন্যতম অংশ; যার অপর কয়েকটি অপরিহার্য দিক হলো বর্ণ সংস্কার, বানান সংস্কার, পরিভাষা প্রণয়ন, আধুনিকীকরণ প্রভৃতি। বাংলা ভাষার মানকরণের পাশাপাশি উল্লিখিত এসব দিকের কোনোটি সম্পর্কেই তাঁর উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ ছিল না। প্রকারান্তরে তাই ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগরকৃত বর্ণ সংস্কার নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি কিংবা ভিন্নমত ছিল না; আর বানান নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত রচনায়, *সবুজ পত্র* পত্রিকার বানান সম্পাদনায় এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে অনেক আধুনিক বিধি অনুসৃত হলেও চলতি রীতির জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ বানানবিধি প্রবর্তনের তাগিদ প্রমথ অনুভব করেননি। ফলে, অবয়ব পরিকল্পনার কাঠামো অনুসারে তাঁর উদ্যোগ হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ। আবার, বাংলা ভাষার একটি ঔপভাষিক রূপবৈচিত্র্যকে অন্যগুলোর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলেও ভাষা হিসেবে ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ-রাষ্ট্রে বাংলার মর্যাদা কী হবে– তা নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন বলে জানা যায় না। ফলে, তাঁর গৃহীত উদ্যোগ কালান্তরের বিচারে সুসমন্বিত ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রমথ চৌধুরী চলতি রীতির চর্চা শুরু করেছিলেন মূলত সাধুরীতির অচলায়তনপ্রতিম আড়ষ্টতাকে লাঘব করার উদ্দেশ্যে। এই আড়ষ্টতা দূর করার নগদ ফল মিলল সেসময়ের বাংলা লেখ্য-গদ্যের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। কিন্তু খুব একটা পাল্টাল না বানান, ভাষার প্রয়োগবিধি; তৈরি হলো না চলতি ভাষার উপযোগী কোনো পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ। এমনকি অকারণে তৎসম শব্দ ব্যবহারের জগদ্দল চেপে রইল বাংলা লেখ্য-ভাষার বুকের ওপর। যে সময়ে প্রয়োজন ছিল নতুন প্রবহমান একটি ভাষারীতি ব্যবহারে দক্ষ প্রজন্ম

তৈরি করা আর তারপর তা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা, সে-সময়ে স্বল্প সংখ্যক সারস্বত সাধকের মধ্যে অত্যন্ত সচেতনভাবেই প্রমথ চৌধুরী সীমাবদ্ধ রাখলেন তাঁর চলতি রীতির প্রস্তাবকে। পাছে স্বনির্মিত আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই আশঙ্কায় *সবুজ পত্র*-এর লেখক সংখ্যাও তিনি কমিয়ে রাখলেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন লেখকের অভাবে নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে লিখে চললেন দীর্ঘকাল; প্রশ্রয় পেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেও। বলতে গেলে কেবল প্রমথ ও রবীন্দ্রনাথই হয়ে রইলেন *সবুজ পত্র*-এর নিয়মিত লেখক। সম্পাদকীয় তুলাদণ্ডে মেপে নান্দনিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে যেভাবে প্রমথ চৌধুরী তাঁর পত্রিকার জন্য লেখা নির্বাচন করতেন, তা ছিল রীতিমতো আনুশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রমথ নিজের পছন্দকেই সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন। তারপরও রবীন্দ্রনাথ সবসময় *সবুজ পত্র*-এর সঙ্গে ছিলেন। আর সে-সময়ে নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশে থাকায় কলকাতার শিক্ষিতজনের কাছে এই পত্রিকা এবং তাতে প্রচারিত ভাষা-আদর্শের কদরও যায় বেড়ে। অবশ্য, বাংলা ভাষারীতি নির্ধারণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর আপাত ভিন্নমত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য :

> রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন রাজধানিতত্ত্বে– রাজধানির উপভাষাই সারাদেশের ভাষা হয়ে ওঠে এমন বিশ্বাস ছিলো তাঁর; তাই তিনি চলিত ভাষার উদ্ভবভূমি হিশেবে কলকাতাকে নির্দেশ করেছেন বারবার।... 'বাংলা কথ্যভাষা'... প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ 'কলিকাতা বিভাগের বাংলা' অবলম্বন করেই প্রস্তুত করেছেন শব্দরূপের তালিকা। প্রমথ চৌধুরী... মানকথ্য বাঙলার ভিত্তি হিশেবে ঢাকা ও কলকাতার ভাষাকে করেছেন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার:... তিনি মানকথ্য বাঙলার ভিত্তি হিশেবে গ্রহণ করেছেন যে উপভাষাটিকে, তার নাম দিয়েছেন 'দক্ষিণদেশি': ... এবং এ অংশের উপভাষাকে তিনি মনে করেছেন সাধুরীতির ভিত্তিকাঠামো। অর্থাৎ যে অঞ্চলের ভাষাকাঠামো অবলম্বনে গ'ড়ে ওঠেছিল সাধুরীতি, সে অঞ্চলের ভাষাকাঠামো ভিত্তি ক'রেই বিকশিত ও সুস্থিত হয় চলতি রীতি। রবীন্দ্রনাথ... পরিণত বয়সে বলেছেন, 'বিশেষ কারণে টাস্‌কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা ব'লে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চারদিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকল দেশী ভাষা ব'লে গণ্য হয়েছে'; এবং একটু পরেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন : 'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব।' (হুমায়ুন, ১৯৮৪ : ৭০-৭১)

দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষার মানকরণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর ভিন্নমত শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যেই স্থিত হয়েছে। তাছাড়া, যে কারণে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা নগর-কেন্দ্রিক মানভাষা গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন তা কিন্তু সাধারণ মানুষের সমাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। তাছাড়া রাজধানীর ভাষাকে (১৯১১র পরে কলকাতা উপনিবেশিত ভারতের রাজধানী না থাকলেও বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল) মানভাষা করার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের যে খুব বেশি জোরালো অবস্থান ছিল না, তা উল্লিখিত উদ্ধৃতির শেষাংশেই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রকারান্তর সমর্থন এবং প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় *সবুজ পত্র*-এর সূত্র ধরে চলতি রীতি লাভ করে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা। এ কারণে, যাঁরা লেখক হিসেবে *সবুজ পত্র*-এর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারলেন না সেরকম শিক্ষিত সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন চলতি রীতি নামক এই লেখ্য-গদ্যকে; এঁরা

সংখ্যায় খুব বেশি নন কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তিতে এঁরা গ্রামীণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। এতে করে সাধু রীতির জায়গা নিতে শুরু করল চলতি রীতি; সাহিত্যে, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে এবং আরও পরে দাপ্তরিক প্রয়োজনেও চলতি রীতির গদ্য ব্যবহৃত হতে থাকল। কিন্তু একই সঙ্গে এই চলতি রীতি যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামের দিকে এগিয়ে চলল, তা হলো : এই ভাষারীতির আর মুখের ভাষার কাছাকাছি হওয়া হলো না। যদিও চলতি রীতির বৈশেষিক লক্ষণ বর্ণনায় এ কথা বলা হয়েই থাকে যে এটি সাধুরীতির মতো মুখের ভাষা থেকে দূরবর্তী নয়, তবুও বাংলা অঞ্চলের অধিকাংশ বাঙালির মুখের ভাষা থেকেই এই চলতি রীতি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধানে অবস্থিত। এর কারণ হলো : অর্থনীতি কিংবা সমাজনীতি নয়, এমনকি কোনো সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়েও নয়; প্রমথ চৌধুরী তাঁর কলাকৈবল্যবাদী নান্দনিক দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে অঞ্চলবিশেষের (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, শান্তিপুর তথা ভাগীরথী নদীর উভয়তীরে প্রচলিত) উপভাষার সাধারণ রূপকে 'শ্রেষ্ঠতম' হিসেবে নির্ধারণ করে বাংলা চলতি ভাষার মানকরণ করেন। বিশেষ করে কৃষ্ণনগরের উপভাষা তাঁর বিবেচনায় চলতি বাংলার আদর্শ বলে গৃহীত হওয়ার উপযোগী। এর বিপরীতে তাঁর কাছে সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য রূপ সম্ভবত ছিল পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রচলিত উপভাষাসমূহ। তাই "বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা" (১৩১৯) প্রবন্ধে এই অঞ্চলের উপভাষাগুলোকে কৃষ্ণনগরের উপভাষার ছাঁচে ঢেলে বিচার করতে চেয়েছেন; শনাক্ত করতে চেয়েছেন উচ্চারণসহ নানাবিধ ত্রুটি। অথচ এভাবে ভেবে দেখেননি যে, পূর্ববঙ্গের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে কিন্তু কৃষ্ণনগরের উপভাষার অনেক ত্রুটি প্রকট হয়ে উঠত। সুতরাং, মানভাষা নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে কেন কৃষ্ণনগরের উপভাষাই গৃহীত হবে তার কোনো সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমথের কাছে ছিল না। তিনি বিবেচনায় নিয়েছেন শ্রুতি-মাধুর্যের বিষয়কে, নান্দনিক উৎকর্ষকে– যা একান্তভাবেই আপেক্ষিক একটি ধারণা। আঞ্চলিকভাবে ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠীর মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে এই চলতি রীতির গদ্য মিলে গেলেও এবং কলকাতাকেন্দ্রিক সমাজের উচ্চশিক্ষিত ক্ষুদ্র একটি শ্রেণির মানুষের কাছে তা সমাদৃত হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার পার্থক্যকে প্রমথ চৌধুরীর প্রস্তাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে, লেখার ভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে মুখের ভাষার সমীপবর্তী হতেই হবে; কিন্তু পক্ষপাতের মধ্য দিয়ে কোনো একটি অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে লেখ্য ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কৌশলটি যথাযথ ছিল না। এর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামরূপে ধীরে ধীরে সমাজে চলতি রীতির গদ্যের কাছাকাছি মুখের ভাষার প্রতিশব্দ হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে 'শুদ্ধ ভাষা' অভিধাটি। এর মানে দাঁড়ায়, বাংলা ভাষার যেসকল বৈচিত্র্য চলতি গদ্যের কাছাকাছি নয় সেগুলো অশুদ্ধ, তাই অগ্রহণযোগ্য! হাল আমলে 'শুদ্ধ' বিশেষণটির পরিবর্তে 'প্রমিত' শব্দটি চালু হলেও সাধারণ বাংলাভাষীদের অনুধাবন ও উপলব্ধির জায়গায় এখনও এই শব্দদুটি অনেকটা সমার্থক। এভাবে ভাষাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস ক্রমান্বয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। এক অঞ্চলের উপভাষাকে বাতিল করে দিয়ে আরেক অঞ্চলের উপভাষাকে মানভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে তা ভাষীদের ওপর আরোপ করতে চাইলেই বিপদ বাড়ে। এর পরিবর্তে সকল অঞ্চলের উপভাষার মর্যাদা নিশ্চিত করে যদি বিশেষ একটি অঞ্চলের ভাষাকে ভিত্তি করে হলেও মানকরণের সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক যুক্তি

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো তাহলে বিভেদের পরিবর্তে ঐক্যের শক্তিই জোরালো হয়ে উঠত। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। ফলে, প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত চলতি রীতির পক্ষে আর বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি হয়ে ওঠা হয়নি। এতে করে নিজেই কিন্তু নিজের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন প্রমথ। কেননা, "কথার কথা" (১৩০৯) প্রবন্ধে তিনি এমন প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেছেন যে, মুখের ভাষা থেকেই লেখার ভাষা গড়ে ওঠা উচিত; এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা মঙ্গলজনক হয় না। অথচ বাস্তবতা হলো এই যে, মান লেখ্য-গদ্যকে অনুসরণ করেই 'কৃষ্ণনাগরিক'গণ বাদে বাংলা অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের জন্য মান কথ্য ভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই প্রমথের কথা মেনে নিলে বলতে হয়, এরূপ পরিস্থিতি মোটেই মঙ্গলজনক নয়। আর তা বাস্তবিকই মঙ্গলজনক হয়নি। এ কারণে আজ অবধি বাংলা ভাষার মানকরণ নিয়ে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। "আমাদের ভাষাসংকট" (১৩২৯) প্রবন্ধে প্রমথ যথার্থই শনাক্ত করেছিলেন যে : বাংলা ভাষা নিয়ে স্বেচ্ছাচার বন্ধ হওয়া উচিত এবং এই ভাষা ব্যবহারের জন্য নিয়ম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অথচ, এই সমস্যার প্রতিকার হিসেবে যেসব পদক্ষেপ তিনি আগে থেকেই গ্রহণ করে আসছিলেন তা একান্তভাবেই আনুশাসনিক। এখন বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, এই আনুশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীল গদ্যে কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পের গদ্য-বৈশিষ্ট্য

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশে প্রমথ চৌধুরী এবং *সবুজ পত্র* উভয়েরই ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবে ও ভাষায় বাংলা ছোটগল্পকে একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি প্রদানে প্রমথ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ করে ছোটগল্পের উপযোগী গতিশীল ভাষাশৈলী সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সমকালে এবং উত্তরকালে ব্যাপকভাবে নন্দিত হয়েছে। গল্পকার প্রমথ চৌধুরীর এসব কৃতিত্বপূর্ণ দিক নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা হয়েছে এবং আরও বিশদ গবেষণার সুযোগও বিদ্যমান। তবে, বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তাঁর ছোটগল্পের কোনোপ্রকার শিল্পমূল্য বিচারের পরিবর্তে এ সংশ্লিষ্ট স্বল্পসংখ্যক নমুনা-পাঠে মানগদ্যের ব্যবহার কীভাবে হয়েছে কেবল তা নিরূপণের চেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে যে সূচকদ্বয় বিশেষ গুরুত্ব পাবে তা হলো : ক) উপভাষার ব্যবহার এবং খ) তৎসম শব্দের ব্যবহার। উল্লিখিত সূচকদুটি বিবেচনার লক্ষ্যে তাঁর বিভিন্ন গল্প থেকে সংগৃহীত চুম্বক অংশসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমেই "চার-ইয়ারি কথা" (১৩২৩) গল্প থেকে উদ্ধৃত নিচের অংশটিতে আলোকপাত করে দেখা যাক :

> আমরা সেদিন ক্লাবে তাস খেলায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম যে রাত্তির যে কত হয়েছে সে দিকে আমাদের কারো খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজল শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এরকম গলাভাঙা ঘড়ি কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙা কাঁসির চাইতেও তার আওয়াজ বেশি বাজখাঁই, এবং সে আওয়াজের রেশ কানে থেকেই যায়– আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অসোয়াস্তি করে। এ ঘড়ির কণ্ঠ আমাদের পূর্বপরিচিত, কিন্তু সেদিন কেন জানি নে তার খ্যান-খ্যানানিটে যেন নতুন করে, বিশেষ করে, আমাদের কানে বাজল। (পৃ. ৬)

এমন ঝরঝরে গদ্য নিঃসন্দেহে বাংলা লেখ্যগদ্যের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু যে বিষয়টি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হলো এতে ব্যবহৃত অতীতকালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়ারূপগুলো; যেমন : 'গিয়েছিলুম', 'উঠলুম'। উল্লেখ্য যে, এরকম ক্রিয়ারূপের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথসহ আরও অনেক লেখকের লেখাতেই সুলভ। কিন্তু বিবেচনার বিষয় হলো এই ক্রিয়ারূপগুলো ভাষার মানরূপের অন্তর্ভুক্ত কি-না। প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য লেখকের চলতি গদ্য পর্যবেক্ষণ করলে এগুলোকে মানরূপ হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়। তাহলে প্রশ্ন জাগে 'গিয়েছিলাম' এবং 'উঠলাম'— এগুলোকে মানভাষার ক্রিয়ারূপ বিবেচনা না করার কোনো সুযোগ আছে কি? অথচ শেষেরগুলোতেই বাংলা ব্যাকরণবিধি অনুসারে অতীতকালের উত্তম পুরুষের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথম দুটিকে পরের দুটির বিকল্প প্রয়োগ বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু এর অসুবিধা হলো, এতে করে বিভিন্ন রকম বিকল্পকে স্বীকার করে নিতে হবে, যা প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যাশিত বাংলা চলতি রীতির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে। তাহলে, স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তাঁর নিজের রচনাতেও আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন উপাদান বিদ্যমান। ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ অবশ্য এখনও বাকি রয়ে গেছে; আর তা হলো: উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি যেহেতু গল্পকারের উত্তম পুরুষের ভাষ্যের উপস্থাপন সেহেতু সংলাপের মতো এতেও আঞ্চলিক উপাদান থাকতে পারে। এটি মেনে নিতে হলে, প্রমথ চৌধুরীর একান্ত অপছন্দ পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বিভিন্ন উপভাষাও বিবিধ কথাসাহিত্যে সংলাপের বাইরেও উত্তম পুরুষের ভাষ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে; যা কোনোভাবেই তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে মানানসই নয়। এই তর্কে যবনিকা টেনে বলা যায় যে, 'গিয়েছিলুম', 'উঠলুম' প্রভৃতি রূপের প্রয়োগ ভাষিক সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার লক্ষণ। এরকম কৃষ্ণনাগরিক প্রয়োগ প্রমথ চৌধুরী কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য যেমন কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, তেমনি অন্য কোনো আঞ্চলিক উপভাষার সচেতন ও পরিশীলিত প্রয়োগও (জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যে বিশেষ কিছু ক্রিয়ারূপের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে) গর্হিত হতে পারে না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তাঁর বাংলা ভাষার মানকরণ-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধসমূহে এরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেননি। প্রসঙ্গত "বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা" (১৩১৯) থেকে গৃহীত নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয় :

> যাদের মুখে ঘোড়া ও গোড়া একাকার হয়ে যায়, তাদের চেয়ে যাদের মুখে ঐ শব্দ নিজ নিজ আকারে বের হয় তাদের ভাষা যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে, এ আর কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। (পৃ. ২৬৭)

'ঘোড়া' এবং 'গোড়া' — একইরকমভাবে উচ্চারিত হলে তা বিড়ম্বনা তৈরি করতেই পারে। কিন্তু এর নিরিখে আরেকটি আঞ্চলিক রূপকে 'শ্রেষ্ঠ' বিবেচনা করা বিপদজনক। কেননা, তাহলে তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ' রূপটির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা (যা না থাকাই অস্বাভাবিক, কৃত্রিমতার লক্ষণ)-কে লুকাতে হয় কিংবা উপেক্ষা করতে হয়। বস্তুত, ভাষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডটিই একটি ভুল মানদণ্ড। এমন কোনো পরম মাপকাঠি খুঁজে পাওয়া যাবে না যার নিরিখে সর্বসম্মতভাবে একটি ভাষার কোনো একটি ঔপভাষিক রূপকে শ্রেষ্ঠ আর বাকি রূপগুলোকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করা সম্ভব। বরং এতে করে একটি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়; কালক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে ভাষা

ব্যবহারকারীদের সাংস্কৃতিক জীবনে ও মনস্তত্ত্বে। এর সমাধান হিসেবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তাদের প্রয়োজন, তাদের সুবিধা– প্রভৃতি বিষয়কে বিবেচনায় না আনার কোনো বিকল্প নেই।

প্রমথ চৌধুরী বরাবরই ভাষায় সাধুরীতির ভারী কাঠামো প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন। সংস্কৃতানুসারী তৎসম শব্দবহুল বাক্য চলতি রীতিতে নিতান্ত অপরিহার্য না হলে ব্যবহার না করাই ছিল তাঁর নির্দেশনা। এর অনুশীলনও তাঁর বিভিন্ন রচনায় লক্ষ করা যায়। তবে, এর ব্যতিক্রম যে তাঁর রচনায় সুলভ নয় সে কথা বলা যাবে না। প্রসঙ্গত নিচের উদ্ধৃতিসমূহ লক্ষণীয় :

(১) বৈচিত্র্য না থাকলেও বড়োবাবুর জীবন যে নিরানন্দ ছিল, তা নয়। তাঁর গৃহের কৌটায় এমন-একটি অমূল্য রত্ন ছিল, যার উপর তাঁর হৃদয়-মন দিবা-রাত্র পড়ে থাকত। তাঁর স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী। বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন পটেশ্বরী। এ নামের সার্থকতা সম্বন্ধে তার পিতৃকুলের, তার মাতৃকুলের কেউ কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নি; ... বড়োবাবুর তাদৃশ সৌন্দর্যবোধ না থাকলেও, তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী– শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী– এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। ("বড়োবাবুর বড়োদিন", পৃ. ৯১-৯২)

(২) একটি অস্থিচর্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ এক টিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করলেন, "তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মশায়ের মতো গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করা চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?" ("ফরমায়েশি গল্প", পৃ. ১২১)

(৩) অচিনপুরের রাজকুমারের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পূর্বরাত্রে ঘুম হয় নি। অবশেষে শেষরাত্রে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সে তো নিদ্রা নয়, সুষুপ্তি। এই সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁর সুমুখে একটি জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলেন। ("সোনার গাছ হীরের ফুল", পৃ. ৪৬৯)

এ ধরনের দৃষ্টান্ত অনেক মিলবে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের পাঠে। উল্লিখিত রচনাংশগুলোতে ব্যবহৃত সর্বনাম আর ক্রিয়ার সাধুরীতির রূপ বসিয়ে দিলেই এদের আর প্রমথ-প্রস্তাবিত চলতি ভাষারীতি বলে চেনার উপায় থাকবে না। তাছাড়া বিষয় অনুসারে ভাষারীতি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় এনেও বলা যায় যে, উদ্ধৃতিগুলো যে তিনটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে তাদের কোনোটিতেই এমন কোনো ওজঃ গুণসম্পন্ন পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না যাতে করে এ ধরনের ভারী তৎসম শব্দবহুল বাক্যবন্ধ ব্যবহারের অনিবার্য কোনো যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলে কি উদ্ধৃতিগুলো ভাষিক গীতলতা-শূন্য, আড়ষ্ট কিংবা সাহিত্যমানে দুর্বল? তা কিন্তু মোটেই নয় (ঠিক যেমন নয় কমলকুমার মজুমদারের সাধুরীতির স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বাক্যকাঠামো)। দেখা যাচ্ছে যে, প্রমথ চৌধুরী নিজেই নিজের প্রস্তাবিত পথের বাইরে হেঁটেছেন বহুবার; অথচ তিনি সুনির্দিষ্ট বিধি তৈরি করে বাংলা ভাষারীতির ছাঁচ তৈরিতে উৎসাহী হয়েছেন।

মানভাষার ভাষা-পরিকল্পনা

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাচিন্তায় নানাবিধ বৈপরীত্য সত্ত্বেও ভাষার মানকরণ নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক কারণে তো বটেই বাংলা ভাষা-পরিকল্পনার দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলা বানান সংস্কারের কয়েকটি প্রচেষ্টা এবং হাল আমলে প্রমিত বাংলার ব্যাকরণ প্রণয়নের প্রচেষ্টাকে স্মরণে রেখেও বলা চলে যে, তাঁর পরে বাংলা ভাষা-পরিকল্পনা নিয়ে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত কোনো সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। তাঁর নির্দেশিত পথের বাইরে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন সাহিত্যিক স্বকীয় ভাষাশৈলী নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন; যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, কমলকুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদুল জহির এবং শূন্য দশকের বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকসহ আরও অনেকে। কিন্তু তাঁদের সূত্র ধরে বাংলা লেখ্য-গদ্যের বিচিত্রতর ও অভিনব প্রয়োগযোগ্যতা প্রমাণিত হলেও মানকরণের বিষয়টি খুব একটা সামনে আসেনি।

ভাষার মানকরণের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত বিস্তৃততর ভাষা-পরিকল্পনা আর এই ভাষা-পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন যথাযথ ভাষা-নীতি। বলা যেতে পারে, সুষ্ঠু ভাষা-নীতি প্রকৃতপক্ষে ভাষা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত (Rubin, 1971)। ভাষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, ভাষীগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও চিন্তনকাঠামো বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে (Kaplan & Baldauf, 2007)। এ কারণে পেডি (Peddie, 1991) মনে করেন, ভাষা-নীতির প্রতীকী (symbolic) ও কার্যকর (substantive) দুটি দিক রয়েছে। প্রথমটি ভাষা-নীতি প্রণয়নের শুভচিন্তা ও আন্তরিক উদ্যোগকে সুগঠিত রূপ প্রদান করে এবং দ্বিতীয়টি সেই চিন্তাকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলে। মূলত, বাংলা ভাষা-পরিকল্পনার সমস্যার বীজটি এখানে নিহিত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগ উপনিবেশ-কাঠামোর মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এরপর দেশভাগের মধ্য দিয়ে উপনিবেশ-উত্তর কালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সংঘটন এবং পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ভাষাভিত্তিক জাতীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায় ভাষা-নীতি তৈরির প্রতীকী যে দিক রয়েছে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সহজতর হয়েছে। এরই সূত্র ধরে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু ভাষা-নীতির কার্যকর দিকটি উপক্ষিত রয়ে গেছে। যদিও পাকিস্তান-পর্বেই বাংলা ভাষার মানরূপ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে সমন্বিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের কোনো সুযোগ তখন ছিল না। বিশেষ করে ঢাকা শহর সে-সময় প্রাদেশিক রাজধানী হলেও এবং কলকাতার সমান্তরালে ঢাকা-ভিত্তিক একটি নাগরিক সমাজ গড়ে উঠতে শুরু করলেও প্রাথমিকভাবে কলকাতার অনুসরণেই একটি মানভাষার কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, নতুন রাজনীতি নতুন ভূগোলকে ব্যবহার করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বাংলা ভাষার যে মানকরণের সুযোগ তৈরি হতে পারত তা করা সম্ভব হয়নি। উল্টো আরোপিতভাবে আরবি-ফারসি শব্দের ভার বাংলা ভাষার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক অপচেষ্টা চলেছে সে-আমলে বারংবার। ফলে, বাংলা ভাষার মানকরণের সম্ভাবনা অধিকতর অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সে-কালে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ করলেও একটি নিজস্ব ভাষারীতি গঠনের কোনো জোরালো তাগিদ তাঁরা অনুভব করেছেন বলে প্রমাণ মেলে না। বস্তুত পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষার

মানকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অভাবের পেছনে একদিকে তৎকালীন শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতি যেমন দায়ী তেমনি দেশীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণও তৎকালে বিদ্যমান ভাষা-আদর্শকেই যথাযথ বলে বিবেচনা করেছেন। তবে, ভাষা যেহেতু ক্রমপরিবর্তনশীল, সেহেতু সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়ে এবং রাজনৈতিক কারণে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে সংযোগ কিছুটা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র একটি মানরূপ গড়ে উঠতে শুরু করে (আবদুল হাই, ১৩৬৫)। কিন্তু এই রূপটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এবং যেহেতু আদিরূপটি বৃহত্তর ভাষীগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না সেহেতু এই প্রাপ্তরূপটিও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনাচারণের সঙ্গে সমন্বিত হলো না। প্রমথ চৌধুরী প্রবর্তিত চলতি রীতির কর্তৃত্ববাদী শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সমাজমনস্তত্ত্বে আগের মতোই লালিত হওয়ায় এর সমান্তরালে ইংরেজি কিংবা আঞ্চলিক উপভাষা কিংবা উভয়ের মিশ্রণে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বাংলা ভাষার অদ্ভুত একটি অপরিশীলিত রূপও প্রচলিত হতে থাকল, যা আজকের সময়ে নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। লেখ্য ভাষা নিয়েও প্রত্যাশিত সহজতা আনয়ন কিংবা যতদূর সম্ভব দ্ব্যর্থহীন কাঠামো প্রণয়নের প্রচেষ্টা খুব একটা সফলতা পায়নি। অথচ, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ায় ঢাকা হয়ে ওঠে এই দেশের মানুষের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভাগ্যান্বেষণে ঢাকায় আসতে শুরু করে; সঙ্গে করে নিয়ে আসে তাদের উপভাষা। এসব উপভাষার একটিকে আরেকটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করে এবং রবীন্দ্রনাথের যুক্তি অনুযায়ী (দ্র. হুমায়ুন, ১৯৮৪) 'রাজধানিতত্ত্বে' অনুপ্রাণিত না হয়ে বরং পূর্বালোচিত সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহকে বিবেচনায় এনে ঢাকাকে ঘিরে বাংলাদেশের বাংলা ভাষার একটি অবিমিশ্র অসাম্প্রদায়িক মানরূপ গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে — যা কেবল মান কথ্য ভাষা হিসেবেই নয় মান লেখ্য ভাষা হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এই মানরূপ নির্বিচারে প্রমথ চৌধুরীর চলতি রীতির আদর্শকে অনুকরণ করবে না, সংস্কৃত ভাষায় কোন শব্দ কোন বানান কেমন ছিল তাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কিংবা কখনও উচ্চারণ কখনও ব্যুৎপত্তির মাপকাঠি ব্যবহারের দোলাচলে আটকে থেকে ভাষায় অপ্রয়োজনীয় দ্ব্যর্থবোধকতা তৈরি করবে না। এই মানরূপ কোনো লুক্কায়িত উদ্দেশ্যমূলক চিন্তা থেকে প্রচল বাংলা শব্দকে পাশ কাটিয়ে অকারণে মধ্যপ্রাচ্যীয় উৎসের শব্দারোপকে উৎসাহ যোগাবে না; এমনকি বাংলা-ইংরেজির মিশেল দেওয়া কোনো মিশ্র-সংহিতাপূর্ণ দোআঁশলা রীতিও এতে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সহজ ও সাবলীল ভাষারীতি হিসেবে আদৃত এই মানরূপের থাকবে বিশেষ মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা। এসব বিবেচনায় নিয়েই বাংলা ভাষার মানকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো কার্যকর ভাষা-নীতি তৈরি না হওয়ায় ভাষা-পরিকল্পনার এ ধরনের বিশাল কর্মযজ্ঞ এখনও অসম্পাদিত রয়ে গেছে।

সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভাষা-পরিকল্পনা নামক ধারণার সফল বাস্তায়নের জন্য অ্যাকাডেমিক গবেষণা যেমন জরুরি তেমনি রাজনৈতিক সদিচ্ছাও একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এ কারণে সমাজভাষাবিজ্ঞানচর্চা, বিশেষত ভাষা-পরিকল্পনাকে রাজনীতি-নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচনা করলে এ বিষয়ক অধ্যয়ন ও গবেষণা

তাৎপর্যশূন্য হয়ে পড়ে (Webb & Du Plessis. 2006)। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা-পরিকল্পনায় রাজনীতি দীর্ঘকাল কোনো অনুকূল ভূমিকা পালন করেনি। দীর্ঘ সামরিক শাসনামলে বাংলা ভাষা-পরিকল্পনা তো দূরের কথা সুকৌশলে এই ভাষাকে ক্রমান্বয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান করার চেষ্টা চলেছে। সম্ভবত বাঙালি নৃগোষ্ঠীর ভাষার ঐক্যে এক হওয়ার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জান্তা-সরকারগুলোকে সর্বদা সন্ত্রস্ত রেখেছে। তাই কখনও পুঁজিবাদী চাহিদা কখনওবা বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষাকে ইংরেজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, ইউরোপের অ-ইংরেজিভাষী দেশগুলোতে স্ব-স্ব মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার কোনো প্রতিযোগিতা নেই; নিজস্ব মাতৃভাষার যথাযথ অর্জন ও শিখন সেসব দেশের ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে অপরিহার্য আর ইংরেজি শিখন তাদের কাছে বিশেষ জরুরি। এমন চেতনা বাংলাদেশে বিকশিত হয়নি। এমনকি, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সূত্রে একের পর এক গণতান্ত্রিক সরকার আসার পরও এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দেশের অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও এদেশের কৃষক ও শ্রমিক সমাজ যেমন সামাজিক মর্যাদায় সবসময় পিছিয়ে থাকে, তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষার মর্যাদা দিবস-সর্বস্ব হৃদয়াবেগের মধ্যেই বন্দি রয়ে গেছে। বাংলা ভাষার এই কালানুক্রমিক অনাদরের সূত্রপাত কিন্তু ঘটেছে ওই প্রারম্ভিক মানকরণজনিত ভারসাম্যহীনতাকে কেন্দ্র করে। কেননা, এখন পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত মানভাষার আদর্শই বাংলা ভাষা বিষয়ক সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। ফলে, কথ্য বাংলার যথাযথ ও কাম্য রূপ নির্ধারণ যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি লেখ্য-বাংলার ক্ষেত্রেও বানানবিধি, বর্ণ সংস্কার, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বাক্যগঠন, ব্যাকরণিক দ্ব্যার্থবোধকতা প্রভৃতি বিষয়ের মীমাংসা বাকি রয়ে গেছে।

উপসংহার

বাংলা ভাষার মানকরণে প্রমথ চৌধুরীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এর ধারাবাহিক বিবর্তন ও বিকাশ ঘটেনি বিধায় তাঁর ভাষারীতি বিষয়ক চিন্তার সীমাবদ্ধতার দিকসমূহ আজও আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা কেবল সাহিত্যের বাহন নয়, বরং সকল প্রকার সংজ্ঞাপনের উপায়। তাই ভাষার মানকরণে সাহিত্য-প্রত্যাশিত নান্দনিক উৎকর্ষ যেমন বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তেমনি মামুলি মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রকাশ-উপযোগিতাও সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করা উচিত। আর এই দুটো প্রান্তকে ভাষার অভিন্ন কোনো একটি সামান্য রূপ দিয়ে স্পর্শ করতে পারলেই মানভাষা টেকসই হয়ে উঠবে। কেননা, এতে করে বৃহত্তর ভাষীগোষ্ঠী তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ওই ভাষারূপটি ব্যবহার করবে এবং একে টিকিয়ে রাখবে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

প্রমথ চৌধুরী। (১৩১৯ [১৯১২])। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা', প্রমথ চৌধুরী প্রণীত *প্রবন্ধসংগ্রহ* (দুই খণ্ড একত্র), [১৯৬৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০১০)]-তে সংকলিত, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

— (১৩০৯ [১৯০২])। 'কথার কথা', প্রমথ চৌধুরী প্রণীত *প্রবন্ধসংগ্রহ* (দুই খণ্ড একত্র), [১৯৬৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০১০)]-তে সংকলিত, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

— (১৩২৯ [১৯২২])। 'আমাদের ভাষাসংকট', প্রমথ চৌধুরী প্রণীত *প্রবন্ধসংগ্রহ* (দুই খণ্ড একত্র), [১৯৬৮ (পুনর্মুদ্রণ ২০১০)]-তে সংকলিত, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

— (১৩২৩ [১৯১৬])। 'চার-ইয়ারি কথা', প্রমথ চৌধুরী প্রণীত *গল্পসংগ্রহ* (১৯৪১) গ্রন্থে সংকলিত, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

— (১৩২৩ [১৯১৬])। 'বড়োবাবুর বড়োদিন', প্রমথ চৌধুরী প্রণীত *গল্পসংগ্রহ* (১৯৪১) গ্রন্থে সংকলিত, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

— (১৩৪৯ [১৯৪১])। 'সোনার গাছ হীরের ফুল', প্রমথ চৌধুরী প্রণীত *গল্পসংগ্রহ* (১৯৪১) গ্রন্থে সংকলিত, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

মুহম্মদ আবদুল হাই। (১৩৬৫ [১৯৫৮])। 'আমাদের বাংলা উচ্চারণ', *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*-৩ (১৯৯৪) গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

হুমায়ুন আজাদ। (১৯৮৪ ও ১৯৮৫)। *বাঙলা ভাষা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

Crystal, D. (1995). *The Canibridge Encyclopedia of the English Language*, Cambridge : Cambridge University Press.

Kaplan, R. B., & Baldauf Jr., R. B. (2007). 'Language policy spread : Learning from health and social policy models'. *Language Problems & Language Planning, 31*(2), 107-129.

Haugen, Einar. (1966). Dialect, language, nation. *American Anthropologist* 68 : 922±935.

Milroy, James and Lesley Milroy. (1999). *Authority in Language : Investigating Standard English* (3rd ed.). London : Routledge.

Paffey, Darren. (2010). 'Globalizing Standard Spanish'. *Language Ideologies and Media Discourse: Texts, Practices, Politics*, ed. by Sally Johnson and Tommaso M. Milani, New York : Continuum.

Peddie, R. A. (1991). *One, two, or many? The development and implementation of language policy in New Zealand.* Auckland, NZ: University of Auckland.

Rubin, J. (1971). 'Evaluation and language planning'. In J. Rubin & B. H. Jernudd (Eds.), *Can language be planned? Sociolinguistic theory and practice for developing nations* (pp. 217-252). Honolulu: University of Hawai'i Press.

Trudgill, Peter. (2000). *Sociolinguistics : An Introduction to Language and Society* (4th ed), London : Penguin.

Webb, V., & du Plessis, T. (Eds.). (2006). *The politics of language in South Africa* Pretoria, SA: Van Schaik.